আমাদের রান্নার মতো পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতি খাওয়ার শৃঙ্খলার মতো পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নেই। আমাদের রাঁধুনী স্নান করেছে, কাপড় বদলেছে; হাঁড়িপত্র, উনুন -- সব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে; নাকে মুখে গায়ে হাত ঠেকলে তখনি হাত ধুয়ে তবে আবার খাদ্যদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলাতি রাঁধুনীর চৌদ্দ-পুরুষে কেউ স্নান করেনি; রাঁধতে রাঁধতে চাখছে, আবার সেই চামচে হাঁড়িতে ডোবাচ্ছে।

রুমাল বার করে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল -- কাগজ ব্যবহার করে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই -- সেই হাতে রাঁধতে লাগলো। কিন্তু ধপধপে কাপড় আর টুপি পরেছে। হয়তো একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে দুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রাশীকৃত ময়দার উপর নাচছে -- কিনা ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমি কাল -- দরবিগলিত ঘাম পা বেয়ে সেই ময়দায় সেঁধুচ্ছে। তারপর তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন দুগ্ধফেননিত তোয়ালের উপর চীনের বাসনে সজ্জিত হয়ে পরিষ্কার চাদর বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড় পরা কনুই পর্যন্ত সাদা দস্তানা-পরা চাকর এনে সামনে ধরলে! কোন জিনিস হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই পর্যন্ত দস্তানা।

আমাদের স্নান-করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে পরিষ্কার হাঁড়িতে শুদ্ধ হয়ে রেঁধে গোময়সিক্ত মাটির উপর থালসুদ্ধ অন্নব্যঞ্জন ঝাড়লে; বামুনের কাপড়ে খামছে ময়লা উঠছে। হয়তো মাটি ময়লা গোবর আর ঝোল কলাপাতা ছেঁড়ার দরুন একাকার হয়ে এক অপূর্ব আস্বাদ উপস্থিত করলে!!

আমরা দিব্যি স্নান করে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইওরোপে ময়লা গায়ে, না নেয়ে একটি ধপধপে পোশাক পরলে। এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগাগোড়ার তফাত -- হিঁদুর সেই অন্তর্দৃষ্টি, তা আগাপাস্তলা সমস্ত কাজে। হিঁদু -- ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি -- সোনার বাক্সয় মাটির ঢেলা রাখে! হিঁদুর শড়ীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হোক! বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুন্ড থাকুক না কেন! বিলাতির মেজে কারপেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল!! হিঁদুর পয়োনালী রাস্তার উপর -- দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না। বিলাতির পয়োনালী রাস্তার নীচে -- টাইফয়েড ফিভারের বাসা!! হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ!

চাই কি? -- পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখধোয়া দাঁতমাজা -- সব চাই, কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই -- 'আচারঃ প্রথমো ধর্মঃ'। আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া। -- সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার-ভ্রষ্টের কখন ধর্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না? এত ওলাওঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া -- কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী!!!

আহার ও পানীয়

আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে আত্মসম্বন্ধী অচলা স্মৃতি হয় -- এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ই মেনেছেন। তবে শঙ্করচার্যের মতে[১] 'আহার' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়জ্ঞান আর রামানুজাচার্যের মতে ভোজ্যদ্রব্য। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয়সকল যথাযথ কার্য কি করেই বা করে? কদর্য আহারে ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণশক্তির হ্রাস হয় বা বিপর্যয় হয়, এ-কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ।

[১] আহ্রিয়তঃ ইত্যাহারঃ, শব্দাদির্বিষয়জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায় আহ্রিয়তে -- শঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭।২৬

অজীর্ণ দোষে এক জিনিসকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি-আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোন বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করতে, তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব; যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে আধারটা নিয়েই টানা-হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাঁজ লশুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্টবুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট-কেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্তদোষ থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই করতে পারে, আশ্রয়দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ -- 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না', তবে অনেক স্থলেই 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে একটা কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এ স্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগদ্‌গুরুদের জীবনী পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার করে গেছেন। জাতিদুষ্ট অন্নভোজন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মতো শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নেই। সমস্ত ভূমন্ডলে আমাদের দেশের মতো পবিত্র দ্রব্য আহার করে, এমন আর কোন দেশ নেই। নিমিত্ত দোষ সম্বন্ধে বর্তমান কালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা দাঁড়িয়েছে; ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়া, এ সব মহা অপবিত্র দেখতেই পাচ্ছ, কিরূপ নিমিত্তদোষে দুষ্ট ময়লা আবর্জনা পচা পক্কড় সব ওতে আছেন -- এর ফল হচ্ছে তাই। এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ, ও ঐ ময়রার দোকানে -- বাজারে খাওয়ার ফল। এই যে প্রস্রাবের ব্যারামের ফ্রকোপ, ও-ও ঐ ময়রার দোকান। ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকের তত অজীর্ণদোষ, প্রস্রাবের ব্যারাম হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি 'বিষলড্ডকে'র অভাব। এ-কথা বিস্তার করে পরে বলছি।

এই তো গেল খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের মধ্যে আবার অনেক মতামত প্রাচীন কালে চলেছে এবং আধুনিক কালে চলছে। প্রথম -- প্রাচীনকাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এক মহা বিবাদ -- আমিষ আর নিরামিষ। মাংসভোজন উপকারক কি অপকারক? তা ছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্যায়, এ এক মহা বিতন্ডা চিরদিনের। এক পক্ষ বলছেন -- কোনও কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয়; আর একপক্ষ বলছেন -- রাখো তোমার কথা, হত্যা না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতর মহাগোল। শাস্ত্রে একবার বলছেন, যজ্ঞস্থলে হত্যা কর, আবার বলছেন, জীবঘাত করো না। হিঁদুরা সিদ্ধান্ত করছেন যে, যজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে মুখে মাংস ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থের পক্ষে অনেকগুলি নিয়ম আছে যে, সে-সে স্থলে হত্যা না করলে পাপ -- যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে-সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশুজন্ম হয়, মনু বলছেন। অপর দিকে জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানিনি, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক, যে যজ্ঞ করবে বা নিমন্ত্রণ করে মাংস খাওয়াবে তাকে সাজা দিচ্ছেন।

আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে, তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মানছেন![২] বর্তমান কালে শাস্ত্রও শুনবে

---

[২] সীতামাদায় বাহুভ্যাং মধুমৈরেয়কং শুচি।
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচিমিন্দ্রো যথামৃতম্‌।।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি বিবিধানি ফলানি চ।
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাররন্‌।। -- রামায়ণ, উত্তর ৫২

সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।

না, মহাপুরুষ বলেছেন বললেও শোনে না। পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নিরোগ হয় ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্পকথা, তাহলে হিঁদুরা নীরোগ হত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত রোগে লোপাট হয়ে যেত এত দিনে। একপক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন যে, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম করতে পারে; অপর পক্ষ বলছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হত; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান্ ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চীনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক-পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দশা দেখ -- আর জাপানীরাও ঐ ছিল; মাংসাহার আরম্ভ করে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড় লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারে বদহজম, আর এক পক্ষ বলছেন -- সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠশুদ্ধিরোগ শাক-পাতড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তা বলে কি দুনিয়াসুদ্ধকে তাই করতে চাও? ফলকথা, চিরকালই মাংসাশী জাতিরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের ধুম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আর্যসমাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংস খাওয়া একান্ত আবশ্যক; আর পক্ষ বলছেন, একান্ত অন্যায়। এই তো বাদ-বিবাদ চলছে।

সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তো বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে জে হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম-কর্ম-ভেদ আহারাদি সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরাবিষ-ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ; আর খাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বইকি। যতদিন মনুষ্য-সমাজে এই ভাব থাকবে -- 'বলবানের জয়', ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোনও রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার করতে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেষা যাবেন! রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বললে চলে না -- জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে কোঁদল। এক পক্ষ বলছেন যে ভাত, আলু, গম, যব, জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান খাদ্যও কিছুই নয়, ও-সন মানুষে বানিয়েছে, ঐ সব খেয়েই যত রোগ। শর্করা-উৎপাদক (starchy) খাবার রোগের ঘর। ঘোড়া গরুকে পর্যন্ত ঘরে বসে চাল গম খাওয়ালে রোগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ঘাস শাক পাতা প্রভৃতি হরিৎ সবজিতে শর্করা-উৎপাদক পদার্থ বড্ড কম। বনমানুষ জাতি বাদাম ও ঘাস খায়, আলু, গম ইত্যাদি খায়না; যদি খায় তো অপক্ক অবস্থায় যখন স্টার্চ (starch) অধিক হয়নি! এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতন্ডা চলছে। এক পক্ষ বলছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ -- এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল ফলাহারী অনেক দিন পর্যন্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড়-গোড়ে জং ধরতে দেয় না।

যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবী পুরীং পুনরুপাগতা।। -- রামায়ণ, অযোধ্যা ৫৫

উভৌ মধ্বাসবক্ষিপ্তৌ উভৌ চন্দনচর্চিতৌ
উভৌ পর্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জুনৌ।। -- মহাভারত, আদিপর্ব

এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, ঐমন খাওয়া দাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে; যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করার শক্তি রইল?

ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ি। ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাঙলা দেশের জন্য এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙালী কবি লুচি-কচুরির বর্ণনা করছেন? ও লুচি-কচুরি এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালেভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি 'পাকি রসুই' খেয়ে থাকে এমন লোক তো দেখিনি! মথুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লড্ডুকপ্রিয়; দু-চার বৎসরেই চোবের হজমের সর্বনাশ হয়, আর চোবেজী চূরণ খেয়ে মরেন।

গরিবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারের খাদ্যদ্রব্যে কিছুই নেই, একদম উলটো আছেন বিষ -- বিষ -- বিষ। পূর্বে লোকে কালেভদ্রে ঐ পাপগুলো খেত; এখন শহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা শহরে বাস করে, তাদের নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণরোগে অপমৃত্যু হবে তার কি বিচিত্র! খিদে পেলেও কচুরি জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও -- সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ঢাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুধ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণীদের মতো খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোলমাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাদবার পয়সা থাকে, খাও; তবে ও পশ্চিমি নানাপ্রকার গরম মসলাগুলো বাদ দিয়ে। মসলাগুলো খাওয়া নয় -- ওগুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাইশুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদ; প্যারিস রাজধানীর ঐ সূপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কছি কলাইশুঁটি খুব সিদ্ধ করে, তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তারপর একটা দুধছাঁকনির মতো তারের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আসবে। এখন হলুদ ধনে জিরে মরিচ লঙ্কা, যা দেবার দিয়র সাঁতলে নাও -- উত্তম সুস্বাদ সুপাচ্য ডাল হল। যদি একটা পাঁঠার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে তো উপদেয় হয়।

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধুম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দু-চার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদহজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হল? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া দুটোই বদহজম। পায়ের মাংস লোহার মতো শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন (albumen) দেখা দিয়েছে বলেই 'হাঁ' করে বসো না। ও-সব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও। অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁটো আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পারো ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ -- 'ভাল করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা বল্'। পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা! পারো যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্ধের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন [ধনী] হওয়া, আর কুঁড়ের বাদশা হওয়া -- দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগী, সেটা তো হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে আছে। যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো? সেধে রোগ অকালমৃত্যু ডেকে আনলে কে কি করবে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়োনা না একদম। খাম্বীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর

হয়ে দাঁড়ান। কোনও খাম্বীরদার জিনিস খাবে না, এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্বপ্রকার খাম্বীরদার জিনিসের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে-কোন জিনিস মিষ্টি থেকে টকেছে, তার নাম 'শুক্ত'; তা খেতে নিষেধ -- কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয় -- উত্তম জিনিস। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয় তো তাকে পুর্নবার খুব আগুনে সেকে খেও।

অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জলশুদ্ধির বড়ই ধুম। এখন ঐ যে ফিলটার ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিলটার জলকে ছেঁকে দেয় মাত্র, কিন্তু রোগের বীজ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, ওলাওঠা প্লেগের বীজ তা যেমন তেমনি থাকে; অধিকন্তু ফিলটারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁরান। কলকেতায় যখন প্রথম ফিলটারকরা জল হল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাওঠা হয় নাই; তারপর যে কে সেই, অর্থাৎ সে ফিলটার মশাই এখন স্বয়ং ওলাওঠা বীজের আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিলটারের মধ্যে দিশি তেকাঠার ওপর ঐ যে তিন-কলসীর ফিলটার উনিই উত্তম, তবে দু-তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে নিতে হবে। আর ঐ যে একটু ফটকিরি দেওয়া -- গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফটকিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতি ফিলটার-মিলটারের চোদ্দপুরুষের মাথায় ঝাঁটা মারে, কলের জলের দুশো বাপান্ত করে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পারলে নির্ভয় হয় বটে। ফটকিরি-থিতোন জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ব্যবহার কর, ফিলটার-মিলটার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই বাষ্পকে জল করে; তারপর আর এক যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বাঢু তার মধ্যে পুরে দেয়, যে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায় [তার পরিবর্তে]। সে জল অতি বিশুদ্ধ; ঘরে ঘরে এখন দেখছি তাই।

যার দু-পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুড়ি মন্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না তো কি? এত বড় ষন্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাইমন্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান দেশে বাস, দিনরাত কসরত! আর আমাদের অগ্নিকুন্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নড়ে বসতে চাইনি, আর আহার লুচি কচুরি মেঠাই -- ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা!! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দুকুড়ি কই মাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে; 'কলকেত্তা'ই হওয়ার এই ফল!! আর সর্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার-বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব করতে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে তো অমনি একটু ওষুধ দাও; পোড়া বদ্দিও বলে না যে, দূর কর্ ওষুধ, যা, দুক্রোশ হেঁটে আস্‌গে যা। নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি শুক্তো মোচার ঘন্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশি কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্যাদা বুঝছ না, এই আপসোস। খাবার নকল কি ইংরেজের করতে হবে -- সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব-বাঙলায়, ওদের নকল কর যত পারো। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ; শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক মাত্র -- আধা-সাঁওতালী বীরভূম বাঁকড়োয় দাঁড়াবে!! তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্বনেশে ময়দার তালে হাতে-মাটি দেওয়া ময়রার দোকানরূপ সর্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম বাঁকড়ো ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও ঢাঁইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে 'সইভ্য' হচ্ছে!! নিজেরা তো উচ্ছন্ন গেছে, আবার দেশসুদ্ধকে দিচ্ছে, এই তোমরা বড্ড সভ্য, শহুরে লোক! তোমাদের মুখে ছাই! ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জনাগুলো খেয়ে উদারময় হয়ে মর-মর, তবু বলবে না যে, এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে -- নোনা লেগেছে!! কোন রকম করে শহুরে হবে!!

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তো এই মোট কথা শুনলে। এখন পাশ্চাত্যরা কি খায় এবং তাদের আহারের ক্রমশঃ

কেমন পরিবর্তন হয়েছে, তাও কিছু বলি।

গরিব অবস্থায় সকল দেশের খাওয়াই ধান্যবিশেষ; এবং শাক-তরকারি মাংস বিলাসের মধ্যে এবং চাটনির মতো ব্যবহৃত হয়। যে দেশে যে শস্য প্রধান ফসল, গরিবের প্রধান খাওয়া তাই; অন্যান্য জিনিস আনুষঙ্গিক। যেমন বাঙলা ও উড়িষ্যায়, মাদ্রাজ উপকূলে ও মালাবার উপকূলে ভাত প্রধান খাদ্য; তার সঙ্গে ডাল তরকারি, কখন কখন মাছ মাংস চাটনিবৎ।

ভারতবর্ষে অন্যান্য সর্বদেশে অবস্থাপন্ন লোকের জন্য গমের রুটি ও ভাত; সাধারণ লোকের নানাপ্রকার বজরা মড়ুয়া, জনার, ঝিঙ্গোরা প্রভৃতি ধান্যের রুটি প্রধান খাদ্য।

শাক, তরকারি, ডাল, মাছ, মাংসের সমস্তেরই -- সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ রুটি বা ভাতকে সুস্বাদ করবার জন্যে ব্যবহার, তাই ওদের নাম ব্যঞ্জন। এমন কি পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য দেশে অবস্থাপন্ন আমিষাশী লোকেরা -- এমন কি রাজারাও -- যদিও নিত্য নানাপ্রকার মাংস ভোজন করেন, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আধ সের মাংস নিত্য খায়, সে এক সের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিত খায়।

পাশ্চাত্যদেশে এখন যে সকল গরিব দেশ আছে [তাদের] এবং ধনী দেশের গরিবদের মধ্যে ঐ প্রকার রুটি এবং আলুই প্রধান খাদ্য; মাংসের চাটনি মাত্র -- তাও কালেভদ্রে। স্পেন, পোর্তুগাল, ইতালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশে যথেষ্ট দ্রাক্ষা জন্মায় এবং দ্রাক্ষা-ওয়াইন অতি সস্তা। সে সকল ওয়াইনে মাদকতা নাই (অর্থাৎ পিপেখানেক না খেলে তো আর নেশা হবে না এবং তা কেউ খেতেও পারে না) এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। সে দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ-মাংসের জায়গায় ঐ দ্রাক্ষারস দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল -- যেমন রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে দরিদ্র লোকের আহার প্রধানতঃ রাই-নামক ধান্যের রুটি ও এক-আধ টুকরা সুঁটকি মাছ ও আলু।

ইওরোপে অবস্থাপন্ন লোকের এবং আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতার খাওয়া আর এক রকম -- অর্থাৎ রুটি ভাত প্রভৃতি চাটনি এবং মাছ-মাংসই হচ্ছে খাওয়া। আমেরিকায় রুটি-খাওয়া নাই বললেই হয়। মাছ মাছই এল, মাংস মাংসই এল, তাকে অমনি খেতে হবে, ভাত-রুটির সংযোগে নয়। এবং এজন্য প্রত্যেক বারেই থালা বদলানো হয়। যদি দশটা খাবার জিনিস থাকে তো দশবার থালা বদলাতে হয়। যেমন মনে কর, আমাদের দেশে প্রথমে শুধু শুক্তো এল, তারপর থালা বদলে সুধু ডাল এল, আবার থালা বদলে শুধু ঝোল এল, আবার থালা বদলে দুটি ভাত, নয় তো দুখান লুচি ইত্যাদি। এর লাভের মধ্যে এই যে, নানা জিনিস অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোঝাই করা হয় না।

ফরাসী চাল -- সকালবেলা 'কফি' এবং আর-আধ টুকড়ো রুটি-মাখম; দুপুরবেলা মাছ মাংস ইত্যাদি মধ্যবিৎ; রাত্রে লম্বা খাওয়া। ইতালি, স্পেন প্রভৃতি জাতিদের ঐ এক রকম; জার্মানরা ক্রমাগতই খাচ্ছে -- পাঁচ বার, ছ-বার, প্রত্যেক বারেই অল্পবিস্তর মাংস। ইংরেজরা তিনবার -- সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কফি-যোগ, চা-যোগ আছে। আমেরিকানদের তিনবার -- উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর।

তবে এ সকল দেশেই 'ডিনার'টা প্রদান খাদ্য -- ধনী হলে তার ফরাসী রাঁধুনী এবং ফরাসী চাল। প্রথমে একটু আধটু নোনা মাছ বা মাছের ডিম, বা কোন চাটনি বা সবজি। এটা হচ্ছে ক্ষুধাবৃদ্ধি। তারপর সূপ, তারপর আজকাল ফ্যাশন -- একটা ফল, তারপর মাছ, তারপর মাংসের একটা তরকারি, তারপর থান-মাংস শূল্য, সঙ্গে কাঁচা শবজি; তারপর আরণ্য মাংস মৃগপক্ষাদি, তারপর মিষ্টানন, শেষ কুলপি -- 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। ধনী হলে প্রায় প্রত্যেক বার থাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গও মদ বদলাচ্ছে -- শেরি, ক্ল্যারেট, শ্যামপাঁ ইত্যাদি এবং মধ্যে মধ্যে

মদের কুলপি একটু আধটু। থাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচ সব বদলাচ্ছে; আহারান্তে ‘কফি’ -- বিনা-দুগ্ধ, আসমবদ্য -- খুদে খুদে গ্লাসে। এবং ধূমপান। খাওয়ার রকমারির সঙ্গে সঙ্গে মদের রকমারি দেখাতে পারলে তবে ‘বড়োমানুষি চাল’ বলবে। একটা খাওয়ার আমদের দেশের একটা মধ্যবিৎ লোক সর্বস্বান্ত হতে পারে, এমন খাওয়ার ধুম এরা করে।

আর্যরা একটা পীঠে বসত, একটা পীঠে ঠেসান দিত এবং জলচৌকির উপর থালা রেখে এক থালাতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চাল এখনও পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুর্জর দেশে বিদ্যমান। বাঙালী, উড়ে, তেলিঙ্গি, মালাবারি প্রভৃতি মাটিতেই ‘সাপড়ান’। মহীশূরের মহারাজও মাটিতে আঙট পাতে ভাত সাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্মি, জাপানী প্রভৃতি উপু হয়ে বসে মাটিতে থাল রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়; চেয়ারে বসে, কাটি ও চামচ-যোগে খায়। রোমান ও গ্রীকরা কোচে শুয়ে টেবিলের ওপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইওরোপীরা টেবিলের ওপর হতে কেদারায় বসে -- হাত দিয়ে পূর্বে খেত, এখন নানাপ্রকার কাঁটা-চামচ।

চীনের খাওয়াটা কসরত বটে -- যেমন আমাদের পানওয়ালীরা দুখানা সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি দুটো কাটিকে ডান হাতের দুটো আঙুল আর মুঠোর কায়দায় চিমটের মতো করে শাকাদি মুখে তোলে। আবার লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি দুটো কাটিকে ডান হাতের দুটো আঙুল আর মুঠোর কায়দায় চিমটের মতো করে শাকাদি মুখে তোলে। আবার দুটোকে একত্র করে একবাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়-নির্মিত খোন্তাযোগে ঠেলে ঠেলে মুখে পোরে।

সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে এক মাস ধরে খেত; পচে উঠলেও তাকে ছাড়ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠল, চাশ বাস শিখলে; আরণ্য পশুকুলের মতো একদিন বেদম খাওয়া, আর দু-পাঁচ দিন অনশন -- ঘুচল; আহার নিত্য জুটতে লাগল; কিন্তু পছা জিনিস খাবার চাল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা হয় কিছু, আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক আদরের চাটনি হয়ে দাঁড়াল।

এস্কুইমো জাতি বরফের মধ্যে বাস করে। শস্য সে দেশে একদম জন্মায় না; নিত্য ভোজন -- মাছ মাংস; ১০।১৫ দিনে অরুচি বোধ হলে একটুকরো পচা মাংস খায় -- অরুচি সারে।

ইওরোপীরা এখনও বন্য পশু পক্ষীর মাংস না পচলে খায় না। তাজা পেলেও তাকে টাঙিয়ে রাখে -- যতক্ষণ না পচে দুর্গন্ধ হয়। কলকেতায় পচা হরিণের মাংস পড়তে পায় না; রসা ভেটকির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচবে, যত পোকা কিলবিল করবে, ততই উপাদেয়। পলায়মান পনীর-কীটকেও তাড়া করে ধরে উখে পুরবর -- তা নাকি বড়ই সুস্বাদ!! নিরামিষাশী হয়েও প্যাঁজ-লশুনের জন্য ছোঁক ছোঁক করবে, দক্ষিণী বামুনের প্যাঁজ-লশুন নইলে খাওয়াই হবে না। শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ করে দিলেন। প্যাঁজ, লশুন, গেঁয়ো শোর, গেঁয়ো মুরগী খাওয়া এক জাতের [পক্ষে] পাপ, সাজা -- জাতিনাশ। যারা শুনলে এ কথা তারা ভয়ে প্যাঁজ-লশুন ছাড়লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমদুর্গন্ধ হিং খেতে আরম্ভ করলে! পাহাড়ী গোঁড়া হিঁদু লশুনে-ঘাস প্যাঁজ-লশুনের জায়গায় ধরলে। ও-দুটোর নিষেধ তো আর পুঁথিতে নেই!!

সকল ধর্মেই খাওয়া-দাওয়ার একটা বিধি নিষেধ আছে; নাই কেবল ক্রিশ্চানী ধর্মে। জৈন-বৌদ্ধয় মাছ মাংস খাবেই না। জৈন আবার যা মাটির নিচে জন্মায়, আলু মুলো প্রভৃতি -- তাও খাবেনা; খুঁড়তে গেলে পোকা মরবে। রাত্রে খাবে না -- অন্ধকারে পাছে পোকা খায়।

ইহুদিরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ[৩] নয় এবং জাবর কাটে না, তাকেও খাবে না। আবার বিষম কথা, দুধ বা দুগ্ধোৎপন্ন কোন জিনিস যদি হেঁশেলে ঢোকে যখন মাছ মাংস রান্না হচ্ছে, তো সব ফেলে দিতে হবে। এ বিধায় গোঁড়া ইহুদী অন্য কোনও জাতির রান্না খায় না। আবার হিঁদুর মতো ইহুদীরা বৃথা-মাংস[৪] খায় না। যেমন বাঙলা দেশে ও পাঞ্জাবে মাংসের নাম 'মহাপ্রসাদ'। ইহুদীরা সেই প্রকার 'মহাপ্রসাদ' অর্থাৎ যথানিয়মে বলিদান না হলে মাংস খায় না। কাজেই হিঁদুর মতো ইহুদীদেরও যে-সে দোকান হতে মাংস কেনবার অধিকার নেই। মুসলমানরা ইহুদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না; দুধ, মাছ, মাংস একসঙ্গে খায় না এইমাত্র, ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই যে সর্বনাশ, অত মানে না। ইহুদীদের আর হিঁদুদের অনেক সৌসাদৃশ্য -- খাওয়া সম্বন্ধে; তবে ইহুদীরা বুনো শোরও খায় না, হিঁদুরা খায়। পাঞ্জাবে মুসলমান-হিঁদুর বিষম সংঘাত থাকায়, বুনো শোর আবার হিঁদুদের একটা অত্যাবশ্যক খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুতদের মধ্যে বুনো শোর শিকার করে খাওয়া একটা ধর্মবিশেষ। দক্ষিণ-দেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতের মধ্যে গেঁয়ো শোরও যথেষ্ট চলে। হিঁদুরা বুনো মুরগী খায়, গেঁয়ো খায় না। বাঙলা দেশ থেকে নেপাল ও আকাশ্মীর হিমালয় -- এক রকম চালে চলে। মনূক্ত খাওয়ার প্রথা এই অঞ্চলে সমধিক বিদ্যমান আজও।

কিন্তু কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্যন্ত -- বাঙালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মনুর আইনের বিশেষ প্রচার। যেমন বাঙালী মুরগী বা মুরগীর ঢিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ঢিম খায়, নেপালীও তাই; কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম পেলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয়।

এলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত দেশে -- যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়।

এই সকল বিধি-নিষেধের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাস্থ্যের জন্য, তার সন্দেহ নেই। তবে সকল জায়গায় সমান পারে না। শোর মুরগী যা তা খায়, অতি অপরিষ্কার জানোয়ার, কাজেই নিষেধ; বুনো জানোয়ার কি খায় কে দেখতে যায় বল। তা ছাড়া রোগ -- বুনো জানোয়ারের কম!

দুধ -- পেটে অম্লাধিক্য হলে একেপারে দুষ্পাচ্য, এমন কি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সদ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ -- যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরি লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিস, মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরুপাক, কাজেই এ নিষেধ ইহুদীদের মধ্যে। মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক ঢক করে দুধ খাওয়ায়, আর দু-ছ-মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!! এখানকার ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কদের জন্যও এক পোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধ ঘন্টায় খাওয়ার বিধি দেন; কচি ছেলেদের জন্য 'ফিডিং বট্‌ল্' ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মা ব্যস্ত কাজে -- দাসী একটা ঝিনুকে করে ছেলেটাকে চেপে ধরে সাঁ সাঁ দুধ খাওয়াচ্ছে!! লাভের মধ্যে এই যে, রোগা-পটকাগুলো আর বড় 'বড়' হচ্ছে না, তারা ঐখানেই জন্মের শোধ দুধ খাচ্ছে; আর যেগুলো এ বিষম খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠুলে উঠছে, সেগুলো প্রায় সুস্থকায় এবং বলিষ্ঠ।

সেকেলে আঁতুড় ঘর, দুধ খাওয়ানো প্রভৃতির হাত থেকে যে ছেলেপিলেগুলো বেঁচে উঠত, সেগুলো এক রকম সুস্থ সবল আজীবন থাকত। মা ষষ্ঠীর সাক্ষাত বরপুত্র না হলে কি আর সেকালে একটা ছেলে বাঁচত!! সে তাপসেঁক, দাগাফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত -- উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। হরিল্লুঠের তুলসীতলার খোকা ও মা -- দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যমরাজের দূত চিকিৎসকদের হাত এড়াত বলে।

---

[৩] খন্ডিত-খুর

[৪] দেবতার উদ্দেশে যাহা নিবেদিত নয়।